আদিপাপ থেকে জাতি মুক্ত হোক

হারুন হাবীব

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ মাস আগস্ট। স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু এবং ঘোষণা মার্চে। আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ মাস ডিসেম্বর। এ মাসেই সর্বাত্মক এক যুদ্ধের পর স্বাধীন হয় বাংলাদেশ। দু-টুকরো হয়ে যায় ২৪ বছরের পাকিস্তান। এর পরও আছে ফেব্রুয়ারি– যার ২১ তারিখের ভাষা দিবসের উত্থান বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনাকে স্থায়ী আসনে বসিয়েছে।

আমি জানি না বর্তমান সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার কী করবে। হয়ত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'জাতির জনকের' রাষ্ট্রীয় মর্যাদা তারা দেবে। হয়ত দেবে না। ব্যাপারটি নিয়ে একমাত্র সেনাপ্রধান জে. মইন উ আহমেদ ছাড়া কেউই প্রকাশ্যে কিছু বলেননি। সবাই বলবেন এমন আশাও করা যায় না। শেষ বার যেদিন জে. মইন জাতির পিতার মর্যাদা নিয়ে কথা বলেছেন ঠিক তার আগের দিনই জাতির পিতা শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনাকে যৌথবাহিনী তাঁর বাড়ি থেকে একটি চাঁদাবাজির মামলায় নাটকীয়ভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

জে. মইন এর আগেও বেশ ক'বার জাতির পিতাকে যোগ্য মর্যাদা দেয়া হয়নি বলে প্রকাশ্যে কথা বলেছেন। তাঁর আক্ষেপটি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার হওয়ার পর রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অভিনন্দন আসতে থাকে। আমিও খবরের কাগজে লিখেছি। শেষবার তিনি যখন বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রীয় মর্যাদার কথাটি তুললেন, তখনও নানা সংগঠন থেকে আগামী ১৫ আগস্টের আগেই সরকারী ঘোষণাটি দিতে আহ্বান জানানো হয়।

ইতিহাস সচেতন একজন নাগরিক হিসেবে আমিও মনে করি, এমন একটি সরকারী ঘোষণা এলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি এবং জাতির পিতার পরিবারের প্রতি যে বর্বরতা, যে অমর্যাদা দেখানো হয়েছে, সে আদি পাপের কিছুটা হলেও মোচন ঘটবে। তবে আমি মনে করি, জাতির পিতাকে তাঁর জন্য নির্ধারিত স্থানে বসিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান নামের মানুষটিকে যতটা না মর্যাদাবান করা হবে তার চেয়ে অনেক বেশি সম্মানিত হবে জাতি নিজে। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায়। একদিকে বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে তাঁর জায়গায় বসানো হবে আবার তাঁর নীতি-আদর্শ থেকে হাজার যোজন দূরে রাখা হবে দেশকে– এমন আত্ম-প্রতারণা মঙ্গলজনক নয়।

ইদানীং কোনকিছু লেখার তাগিদ বোধ করি না। পণ্ডশ্রম মনে হয়। মনে হয় আমাদের মতো মানুষের হাতে যে বর্ণমালা তার কোন শক্তি নেই। এরপরও তাগিদ বোধ করেছি খবরের কাগজের একটি সংবাদ পাঠ করে। খবরটি এ রকম : দীর্ঘ ছয় বছর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যা মামলার শুনানি শুরু হয়েছে সুপ্রিমকোর্টের আপীল বিভাগে। আগস্টের ৭ তারিখ। দেশের প্রধান বিচারপতি এম. রুহুল আমিনের নির্দেশে সম্প্রতি যে বেঞ্চটি গঠিত হয়েছে সেটিই দীর্ঘ প্রতীক্ষিত আপীল শুনানির কাজ শুরু করেছে। বলাই বাহুল্য, খবরটি আইন ও নৈতিকতার বিচারে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

আমরা কেউই জানি না সম্মানিত বিচারকগণ শুনানি শেষে কী রায় দেবেন। তবে এটুকু জানি সে রায় নিশ্চয়ই দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন লাভ করবে। কারণ বিচার ব্যবস্থার শীর্ষ জায়গাগুলোতে যাঁরা আসীন তাঁরা আইনের মানদণ্ডে সঙ্কট ও বিরোধের মীমাংসা দেন ঠিকই, একই সঙ্গে নৈতিকতার মানদণ্ডকেও সমুন্নত করেন। এ না হলে সমাজ অচল হয়ে যায়, ভাল মন্দের তফাত থাকে না, বিচার ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা বাড়িয়ে তোলে।

বেশ কয়েক বছর আগে থাইল্যান্ড থেকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় মেজর (অব) বজলুল হুদাকে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ড মামলার আরেক মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী। একুশ বছর পর ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে এলে পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের অন্যতম এই নায়ক দেশ থেকে পালিয়ে যায়। শুনেছি ব্যাঙ্ককে গিয়ে দোকান থেকে চুরির অভিযোগে ধরা পড়ে।

ইতিহাস সচেতন মানুষ মাত্রেই জানেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায়, যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটি যখন কেবল উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে, দুঃসহ নানা সঙ্কট, নানা সন্দেহ ও বিষণ্নতার মাঝে যখন স্থিতিশীল হবার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই প্রায় সপরিবারে হত্যা করা হয় রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে। তাঁর পরিবারের প্রায় প্রতিটি সদস্যসহ মোট ২৩ জনকে। এমন কি শিশুপুত্র রাসেলকেও। বেঁচে যান কেবল শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। ভাগ্যক্রমে হাসিনা ছিলেন তাঁর পরমাণু বিজ্ঞানী স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়ার সঙ্গে জার্মানিতে। রেহানাও ছিলেন সেখানে। অতএব ঘাতকের বুলেট ওদের ছুঁতে পারেনি। ছুঁলে আজ নিশ্চয়ই বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে 'চাঁদাবাজি' করার অভিযোগে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যার গ্রেফতার দৃশ্য দেশবাসীকে দেখতে হতো না। এমন কি শেখ রেহানা, ড. ওয়াজেদ মিয়া, জয়, পুতুলসহ অন্যদের এমন দুর্গতি পোহাতে হতো না। ব্যাংক এ্যাকাউন্ট জব্দ হতো না। জব্দ হতো না বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্টের এ্যাকাউন্ট। আমার শুধুই মনে হয়, এত জাতীয় উত্থান-পতনের পর, এত ভয়ঙ্কর পালাবদলের পরও আমরা কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পেরেছি ?

বঙ্গবন্ধুর কন্যা বলে শেখ হাসিনা কি আইনের উর্ধে ? তিনি যদি অপরাধ করেন তাহলেও তাঁকে ছাড় দিতে হবে ? এমনটা যাঁরা মনে করেন আমি তাঁদের দলে নই। আইন যদি নির্মোহভাবে প্রয়োগ করা না যায় তাহলে আইনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা কমে। কিন্তু শেখ হাসিনার ওপর কি আইনের সুবিবেচক প্রয়োগ হয়েছে ? প্রশ্ন উঠেছে। অনেক স্বাধীন জাতীয় দৈনিক, এমন কি বিদেশের গণমাধ্যমগুলো যেভাবে খবর আর সম্পাদকীয় ছেপেছে, তাতে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হলেই ভাল।

দেশের পরিস্থিতি আজ ভিন্নমাত্রার। শুধু আমি কেন ব্যাপকসংখ্যক দেশবাসী ১/১১-এর পরিবর্তনকে মনেপ্রাণে স্বাগত জানিয়েছে। জনসমর্থনপুষ্ট এ পরিবর্তনকে কিভাবে ব্যাখ্যা করব? অপরাধী কে? খালেদা জিয়া ও নিজামীরা যেভাবে নির্বাচনী প্রহসন করে আবারও ক্ষমতায় ফিরতে চেয়েছিলেন, দুর্নীতি করে দেশকে লুণ্ঠিত করেছিলেন, তারা? নাকি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জনমোর্চা বা বৃহত্তর জাতীয় ঐকমত্য– যারা প্রহসনের নির্বাচনকে ঠেকাতে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তারা? নানান বিস্ময়কর ঘটনাপ্রবাহের মাঝ দিয়ে প্রশ্নগুলো আজ সাধারণ মানুষের কাছে বার বার ফিরে আসছে।

দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সমর্থনে একটি বর্তমান সরকার দেশ পরিচালনা করছে। ছয় মাস অতিক্রান্ত হয়েছে সরকারের। সর্বগ্রাসী দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রাম শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক নেতা এবং রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে যে নরকের কীটগুলো আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে তাদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধে খ নেমে এসেছে। মানুষ দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু ক্রমান্বয়েই এ আশঙ্কাও মনে দানা বাঁধছে, শেষ পর্যন্ত এসব রাঘব বোয়ালের কি শাস্তি হবে? নাকি ব্যর্থতায়, সরকারের সঙ্কট-সীমাবদ্ধতায় এসব দুর্নীতিবাজও ভাল মানুষের 'সার্টিফিকেট' নিয়ে আবার বেরিয়ে আসবে?

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে জেলে নেয়া হয়েছে। জরুরী অবস্থার মধ্যেও দেশের সংবাদপত্রের একটি বড় অংশ এই গ্রেফতারকে 'রীতিমতো অগ্রহণযোগ্য' বলে আখ্যায়িত করেছে। এদিকে মাস কয়েক সঙ্কটের পর খালেদা জিয়া এখন বোধকরি ভালই আছেন। প্রায় প্রতিদিন টেলিকনফারেন্স করছেন।

১৮ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলস থেকে ঢাকায় আনা হয়েছে ১৯৭৫ হত্যাকাণ্ডের অন্যতম মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী লে. ক. (অব) এ কে এম মহিউদ্দিন আহমদকে। কোথাও রাজনৈতিক আশ্রয় পায়নি সে। যে বিচার প্রক্রিয়া থেকে সে পালিয়ে বেরিয়েছে দীর্ঘকাল সেই বিচারের হাতেই শেষ পর্যন্ত তাকে সোপর্দ হতে হয়েছে।

চার সাবেক সেনা-কর্মকর্তা দেশের কারাগারগুলোতে অনেক বছর আগে থেকেই ফাঁসির প্রকোষ্ঠে দিন কাটাচ্ছে। এখন মহিউদ্দিন আসাতে সংখ্যা পাঁচে দাঁড়িয়েছে। বাকিদের একজন লে. ক. (অব) আজিজ পাশা মারা গেছে আফ্রিকার মাটিতে পলাতক জীবনযাপন করতে গিয়ে। বাকিরা কে কোথায় আছে জানি না।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর বাংলাদেশ সরকারশূন্য ছিল না। একে একে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছেন জিয়াউর রহমান, আব্দুস সাত্তার, হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এবং খালেদা জিয়া। রাজনীতিতে নয়, এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বড় কলঙ্ক হচ্ছে এঁদের হাতে পরিচালিত সরকারগুলো ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের পালাক্রমিক পুনর্বাসন করেছে। জে. জিয়া এই হত্যাকারীদের বিদেশের দূতাবাসগুলোতে চাকরি দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পরোক্ষে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছে। একই অপরাধ পালাক্রমিকভাবে করে গেছেন জেনারেল এরশাদ ও খালেদা জিয়া। অতএব মনোভাব তাদের পরিষ্কার।

অনেকেরই এ আশঙ্কা ছিল, ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা ক্ষমতা হাতে নিয়ে ১৯৭৫-এর হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে উঠবেন। সংক্ষিপ্ত বিচারে ফাঁসির রসিতে ঝুলাবেন আত্মস্বীকৃত খুনীদের। ব্যাপারটি হতেও পারত। বহু দেশেই এমনটা ঘটে। কিন্তু হাসিনা বা তাঁর সরকারকে সে রকম প্রতিশোধপরায়ণ হতে দেখা যায়নি। অনেকে শেখ হাসিনাকে দোষারোপ করেন। প্রশ্ন করেন, এমনটা করতে গেলেন কেন ? সে যাই হোক, একটি ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডের ২৩ বছর পর যে বিচার তা ঘটেছে সাধারণ আইনে। জাতির জনক শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের বিচার আর একজন সাধারণ মানুষের বিচারের মধ্যে কোন তফাত থাকেনি। প্রতিটি পর্যায়ে অভিযুক্তরা আইনী সহায়তা লাভ করেছে। ১৯৯৬ সালে শুরু হয়ে ১৯৯৮ সালের ৮ নবেম্বর ঘোষণা করা হয়েছে ঐতিহাসিক রায়। সে রায়ে ১৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। হাইকোর্টে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের আপীলের ওপর শুনানি চলেছে মাসের পর মাস। আসামীপক্ষ সর্বাত্মক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ লাভ করেছে। অবশেষে ২০০১ সালে ১২ জনের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখে হাইকোর্ট। বাকিরা মুক্ত হয়েছে।

রাজনীতিবিদগণ আইনের শাসনের কথা বলেন। যখন-তখন বলেন আইন সমানভাবে সকলের জন্য। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃবৃন্দও একই কথা বলেন। একবার ভেবে দেখুন, যে মানুষটি বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রধান নায়ক, যে মানুষটি এ রাষ্ট্রের জনক, তাঁর হত্যাকাণ্ডের বিচারেও 'প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিচারকের অভাব ছিল বছরের পর বছর! মামলাটি হিমাগারে ছিল খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার যতদিন ক্ষমতায় ছিল (২০০১-২০০৬) ততদিন। একদিকে চলছিল রাজনৈতিক বিবেচনায় বিচারপতি নিয়োগের দুর্ভাগ্যজনক প্রক্রিয়া, অন্যদিকে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে 'বিচারপতির অভাব'! সাধারণ মানুষকে এতটা নির্বোধ ভাববার কী কারণ আছে?

যারা স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সরকারের পরিবর্তন কামনা করেন, হত্যাকাণ্ড বা নৃশংসতা দিয়ে কোন সঙ্কটের সমাধান চান না, যারা মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজে আইনের শাসনের উন্মেষ চান, তাঁরা সকলেই চাইবেন– আইন তার নিজস্ব গতিতে চলুক। কাজেই সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে এই মামলার শুনানির খবর একটি সুখবর বটে। দেশের একজন নাগরিক হিসেবে, শীর্ষ বিচারালয় ও সরকারকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক নয়, সে কারণেই বলি, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সঙ্কট কেবল 'দুই বেগমের যুদ্ধ' নয়। যাঁরা এমনটা ভাবেন, তাঁরা সঙ্কটের অতি-সরলীকরণ করেন মাত্র। একবার ভেবে দেখুন, আজ যদি এই 'দুই বেগম' না থাকেন, যে কারণেই হোক অদৃশ্য হন, তাহলেই কি দেশ সঙ্কটমুক্ত হবে? আমরা কি পরম শান্তিতে বসবাস করতে পারব? জাতি কি আগের মতো বিভাজিত থাকবে না? রাজনৈতিক সংঘর্ষ হবে না ? আমার মনে হয় এমনটা ভাবা সুচিন্তিত নয়। 'দুই বেগমের যুদ্ধ' নিয়ে আমরা অনেক কিছু লিখতে পারি। কারণও কিছু আছে। কিন্তু জাতীয় সঙ্কট আরও গভীরে। যাঁরা মনেপ্রাণে এ রাষ্ট্রের সঙ্কট মোচন চান, তাঁদের প্রতি আমার স্বনির্বন্ধ অনুরোধ, জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের সত্যিকার চেতনা ও ইতিহাসকে লালন করেই এই 'কন্ট্রাডিকশনকে' দূর করতে হবে। আর কোন 'শর্টকাট' রাস্তা নেই।

যে দেশে ত্রিশ লাখ মানুষ স্বাধীনতার বেদীমূলে জীবন উৎসর্গ করেছে, সে দেশে তাঁদের ঐতিহাসিক আত্মত্যাগের মর্যাদা দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে তাঁর স্বমর্যাদায় ফিরিয়ে নিতে হবে। ধর্মীয় মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় নয় কঠোরভাবে দমাতে হবে, এবং নিয়ন্ত্রিত নয় অবাধ গণতান্ত্রিক পরিবেশ এনে সব দলমত, ধর্মবর্ণের বিচরণ ক্ষেত্র বানাতে হবে বাংলাদেশকে। এসব করা না গেলে 'ন্যাশনাল কন্ট্রাডিকশন' কমতে পারে না।

[লেখক : মুক্তিযোদ্ধা, লেখক ও সাংবাদিক]

আজ চরমপত্রের জন্মদিন

কবিতা পারভেজ

আজ ৯ আগস্ট, আমার বাবা এম আর আখতার মুকুলের জন্মদিন। বেঁচে থাকলে আজ বাবার বয়স হতো ৭৮। আমি দেশে থাকতে বাবার জন্মদিন উপলক্ষে স্বামীর কর্মস্থল জয়দেবপুর থেকে ঢাকায় চলে যেতাম আমার বাচ্চা দুটোকে নিয়ে। বাবা খুব খুশি হতেন যখন ছেলে মিহির এবং মেয়ে মৌসুমী ওদের নানুকে তাদের বাবার লেখা ও সুর করা জন্মদিনের গানটা শোনাত–

শুভ জন্মদিন শুভ জন্মদিন
তুমি দীর্ঘজীবী হও
এ হাসি যেন চিরদিন
তুমি সবার মাঝে ছড়াও।

এম আর আখতার মুকুল মারা গেছেন তিন বছর হয়ে গেল। গত দু' বছর লিখিনি কয়েকটি কারণে। তারমধ্যে বাবা মারা যাবার পর প্রথম বছরেই মনে হলো চরমপত্রের এম আর আখতার মুকুল, সাংবাদিক, কূটনীতিক, লেখক, ভাষাসৈনিক, শব্দসৈনিক এম আর আখতার মুকুলকে সবাই ভুলে গেছে। খুবই দুঃখ পেয়েছিলাম। সংবাদপত্রগুলোও তাঁর কথা ভুলে গেছে ব্যতিক্রম জনকণ্ঠ ছাড়া। অথচ আমার বাবা আজীবন আপাদমস্তক একজন সাংবাদিক। আজকের অধিকাংশ সাংবাদিকের "মুকুল ভাই"। অন্যের কথা কি বলব আমার

বাবার ভাইবোনদের মধ্যেও তো পড়ুয়া-লিখিয়ে কম নেই। অনেকেই স্বনামধন্য। তাঁরাও বাবাকে ভুলে গেছেন। ব্যতিক্রম কেবল ছোট ফুফু শামীম মমতাজ দীপ্তি। এই ফুফুই সময় সুযোগ পেলে তাঁর ভাইয়ের কথা মনে রাখেন। লেখেন। এই শামীম মমতাজ দীপ্তি ফুফু এবং তাঁর স্বামী এয়ার ভাইস মার্শাল (অব.) মমতাজ উদ্দীন আহমদের একান্ত প্রচেষ্টায় এবং ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকার সহযোগিতায় এবারে বাবার নামে একটি রাস্তার নামকরণ হবে। শুনেছি ধানমণ্ডি মহিলা স্টেডিয়ামের পেছনের রাস্তাটার নামকরণ হবে এম আর আখতার মুকুল সরণি। মেয়র সাদেক হোসেন খোকাকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। এ সুযোগে তাঁদেরকে ধন্যবাদসহ কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা এখন মাঝে মধ্যে বাবার কথা স্মরণ করেন–আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, অধ্যাপক মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ, আলী হাবিব, স্বদেশ রায়, নিয়ামত হোসেন, লুৎফর রহমান রিটন এবং গোটা জনকণ্ঠ পরিবার। আজকের দিনে আমি সেই সব মানুষের প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই যাঁরা আমার বাবার শেষ দিনগুলোতে লন্ডনে এবং ঢাকায় হাসপাতালে এসে দোয়া করেছেন, চোখের পানি ফেলেছেন, রক্ত দিয়েছেন আর আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন।

দৈনিক জনকণ্ঠের পাতায় আর আমার বাবার কোন লেখা দেখতে পাই না। আলী যাকেরের ভাষায় লেখার মেশিন এম আর আখতার মুকুল হারিয়ে গেছে। যদি সে মেশিন আজ চালু থাকতো তাহলে আমি নিশ্চিত, অবিরাম লিখে যেতেন শেখ হাসিনার মুক্তির কথা। নিজে কখনও আওয়ামী লীগের সাথে যোগ দেননি কিন্তু আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু এবং শেখ হাসিনার এমন অন্ধভক্ত আমি আর দুটি দেখিনি। আমার খুব মনে আছে, একদিন আওয়ামী লীগ সম্পর্কে তাঁর সামনে একটা বিরূপ মন্তব্য করেছিলাম; ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠলেন যেন। বললেন তুই কি আজকাল বিএনপির লোকজনের সাথে ওঠাবসা করছিস? আওয়ামী লীগের কোন দোষত্রুটি তুলে ধরলেই নানান সব যুক্তিতর্ক দিয়ে উল্টো আমাকে বুঝিয়ে দেবেন–হয় আমি ভুল জানি নয়ত ভুল বুঝেছি।

বলতে গেলে এম আর আখতার মুকুল ঢাকা শহরে একটা স্লোগানই তৈরি করে দিয়েছিলেন, তবুও বই পড়ুন। তাঁর যুক্তি ছিল যত দুঃখ সুখ যন্ত্রণা অভাব অভিযোগ অজুহাত থাকুক–তবুও বই পড়ুন। তাঁর মৃত্যুর পর সবকিছু আর তেমন ভাবে থাকল না "তবুও বই পড়ুনের" জন্য। তবুও জুয়েল সাহেবকে ধন্যবাদ। তিনি স্মৃতিটাকে স্লোগানটাকে ধরে রেখেছেন সেই বেইলী রোডে।

আমার বাবা তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে খুব গর্ববোধ করতেন। রসিকতা করে বলতেন, আমার জন্ম তো ভারত অবিভক্ত থাকাকালে। আমি ভারতের স্বাধীনতার অগ্রদূত। আমার জন্মদিনটিকেই পরকর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী বেছে নিয়েছিলেন স্বাধীনতার লক্ষ্যে তাঁর "কুইট ইন্ডিয়া" মুভমেন্ট শুরু করার জন্য। ৯ আগস্ট ১৯৪২ সালে সেই মুভমেন্ট শুরু হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হবার আগ পর্যন্ত ৯ আগস্ট কংগ্রেস কর্তৃক অবিভক্ত ভারতে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালিত হতো। বাংলাদেশের মানুষের কাছে ১৯৭১-এর সাতই মার্চ যেমনভাবে স্বাধীনতার ঐতিহাসিক পটভূমি তেমনিভাবেই ৯ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক। বাবা বলতেন সেই ৯ আগস্টের মুকুল আমি।

সেই ৯ আগস্টে জন্ম নেয়া এম আর আখতার মুকুল ৯ আগস্টের স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তাঁর বিখ্যাত 'চরমপত্র' নিয়ে। চরমপত্রের সেই সময়টাতে বয়স ছিল কম। তার গুরুত্ব ততটা বুঝিনি। যতই দিন গেছে বয়স বেড়েছে মানুষের মুখে শুনেছি সেই চরমপত্রের বিজয়গাথা ততই উপলব্ধি করেছি– কী অসীম দেশপ্রেম আর ডিভোশন থাকলে এমন সার্থক 'ওয়ান ম্যান শো' করা সম্ভব।

সিডনিতে শ্রদ্ধেয় সিরাজুস সালেকীনের গড়া একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন আছে 'প্রতীতি' নামে। আমি নিজেও সে সংগঠনের একজন সক্রিয় সদস্য। ২০০৪ সালের ২৬ জুন বাবা মারা যাবার পর পরই প্রতীতির একটা পূর্বঘোষিত অনুষ্ঠন ছিল। সে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সে সময়ে অস্ট্রেলিয়াস্থ বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রদূত লে. জে. (অব.) এম হারুন অর রশীদ বীরপ্রতীক । সেদিনকার সেই অনুষ্ঠান শুরুর আগে প্রথম আধাঘণ্টা প্রতীতি এম আর আখতার মুকুলের সদ্য বিদেহী আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেছিল । সেই অনুষ্ঠানে মাননীয় রাষ্ট্রদূত লে. জে. (অব.) এম হারুন অর রশীদ বীরপ্রতীক বলেছিলেন– আমরা ফৌজি লোক এবং আমি মুক্তিযোদ্ধা। আমি এম আর আখতার মুকুলকে বিশ্লেষণ করি অন্যভাবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের লাগে দু'ধরনের অস্ত্র। এক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র যেমন ধরুন রাইফেল, মেশিনগান ইত্যাদি আর অন্যটি হলো স্নায়বিক অস্ত্র যা মনোবলকে অটুট রাখতে সাহায্য করে। তখন আমাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের উৎস বিভিন্ন থাকলেও স্নায়বিক অস্ত্রের একমাত্র উৎস ছিল মুকুল সাহেবের চরমপত্র। ছেলেদের যখন ট্রেনিং দিতাম অথবা যুদ্ধের এ্যাসাইনমেন্ট দিতাম– ওদের কথা ছিল স্যার আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাড়ে তেইশ ঘণ্টা যুদ্ধ করতে রাজি শুধু চরমপত্রের আধা ঘণ্টা কোন এ্যাসাইনমেন্ট নাই। আমি ছেলেদের বলতাম, ওই আধা ঘণ্টা আমারও সব কিছু বাদ। কথাটা আমি হুবহু হয়ত বলতে পারিনি কারণ তখন তো আমি ঢাকায়। পরবর্তীতে আমার স্বামী ড. কাইউম পারভেজের কাছ থেকে শুনেছি আর কেঁদেছি। ভেবেছি লে. জে. (অব.) এম হারুন অর রশীদ বীরপ্রতীকের মতো করে তো আমার বাবাকে আমি কখনও দেখিনি। সেদিন তাঁকে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ পাইনি। আজ আমার এ লেখায় তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই। আসলে কতজন যে কতভাবে এম আর আখতার মুকুলকে দেখেছেন। তিনি যে সবার কাছেই প্রিয় ছিলেন তাও নয়। কারণ তিনি তো মানুষ। ভুলত্রুটি তাঁর থাকতেই পারে। সে ভুলত্রুটির ক্ষমাটা আজ আমিই আমার বাবার হয়ে চেয়ে নেই। আপনারা তাঁকে ক্ষমা করবেন। দোয়া করবেন।

আর আমি? নাইবা থাকল আমার বাবা এ দুনিয়ায় তবুও আমার সেই বাচ্চা দুটোকে নিয়ে আজও তাঁর জন্মদিনে গেয়ে যাব–

শুভ জন্মদিন শুভ জন্মদিন
তুমি দীর্ঘজীবী হও
এ হাসি যেন চিরদিন
তুমি সবার মাঝে ছড়াও।

[লেখক : এম আর আখতার মুকুলের কন্যা]

সাইফুর রহমানের কান্না

বেলাল বেগ

মানুষ অনেক কারণে কাঁদে। বয়স ভেদে কান্নার কারণেরও ভেদাভেদ হয় । ক্ষিধা পেলে, ভয় পেলে বা নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে, বাচ্চারা কাঁদেন কিন্তু এসব ক্ষেত্রে বড়রা কাঁদে না। বড়দের কান্নার কারণ প্রিয়জনের মৃত্যু, শারীরিক বা মানসিক অসহনীয় আঘাত।

কিন্তু সাইফুর রহমান কারাগারে বন্দী পুত্রকে দেখে কাঁদলেন কেন?

সাইফুর রহমান গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের একটা বিরাটকায় পরাক্রমশালী বাঘা মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশীদের তথাকথিত রাজনৈতিক সচেতনতার ঘনকুয়াশা, সাধারণভাবে গণমাধ্যমসমূহের অর্থনীতি-বিশ্লেষণ-ক্ষমতার অপ্রতুলতা, পঁচাত্তরে হত্যা

ও ক্যুর মাধ্যমে বাংলাদেশ দখলকারী নেপথ্য-শক্তির নিঃশর্ত সর্বময় সমর্থন ও উৎসাহ, দুর্বল রাজনৈতিক দল ও পার্লামেন্টের অকার্যকারিতা ইত্যাদি কারণে সাইফুর রহমান আমাদের জাতির ভাগ্য পরিচালনার আসনে অমর, অজর একজন দেবতার মতো বসেছিলেন। তাঁকে ঘাটাবে এমন সাহস বিএনপির কারও থাকা তো দূরের কথা, আওয়ামী লীগেরও কেউ একটা বড় সাহস করত না। তিনি যে কেবল বাংলাদেশের অর্থনীতির সব অলিগলি নখদর্পণে রাখতেন তা নয়, বিশ্ব-অর্থনীতির প্রভুদের তুষ্ট রেখে বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু রাখার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এহেন লৌহমানব কাঁদতে পারে এটা কারও মাথায় আসতেই পারে না। মিসরের স্ফিংসের চোখে কি কেউ জল দেখবে ভাবে ? তাই কারাগারে দুর্নীতির দায়ে আটক পুত্র নাসের রহমানকে বুকে জড়িয়ে সাইফুর রহমান কান্নায় ভেঙ্গে পড়লে উপস্থিত সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণ হতবাক ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়বেন, সেটাই স্বাভাবিক।

সাইফুর রহমানের কান্নার খবর পত্রিকায় পড়ে লাখ লাখ মানুষের মনেও একটা ট্র্যাজেডি-জাত গভীর দুঃখবোধ হয়েছিল। একটি গভীর কান্না সাধারণ বাঙালীর হৃদয়কেও দলিত-মথিত করে হা-হুতাশ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছে।

বাঙালীর কান্না কিন্তু একজন সাইফুর কিংবা তার জেলে-বন্দী পুত্রের জন্য নয়। বাঙালীর এ কান্নার প্রকৃত অর্থ রাজাকার-আলবদর, জামায়াত-জেএমবি জাতীয় রক্তলোলুপ অমানুষগুলো ছাড়া, তার রাষ্ট্রের কর্ণধার থেকে রাস্তার উলঙ্গ ভিক্ষুকটাও একইভাবে বুঝবে কারণ ওরা সবাই বাঙালী। সাইফুরের কান্না যে একজন পরাজিত বাঙালী পিতার এ সত্য সকলের চোখ ভিজিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ চোখগুলোকে ফুটিয়েও দিয়েছে।

সাইফুর রহমান একজন বাঙালী নেতা ছিলেন কিন্তু নিজকে 'বাংলাদেশী' হিসাবে পরিচয় দিয়ে নিজে সে সত্য অস্বীকার করেছিলেন। সাইফুর রহমান যদি একজন প্রকৃত বাঙালী নেতা হতেন, তিনি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত, শামসুর রাহমান, হুমায়ুন আজাদ পড়তেন এবং কখনও নষ্টের দলে ভিড়তেন না। কায়মনোবাক্যের একজন বাঙালী কখনও আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে' ধরণীতে আসে না। বাঙালী মাত্রই জন্মগতভাবে সমাজতন্ত্রী-'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে মোরা পরের তরে'। একজন শিক্ষিত বাঙালী জানে তার পূর্ব-পুরুষেরা কখন গরিব ছিল না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি বাঙালীকে অন্যান্য ভারতবাসীর সঙ্গে দু' শ' বছরে গোলাম রেখে, শোষণ চালিয়ে দরিদ্র বানিয়েছিল। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' বলে যে বাঙালী ইচ্ছা প্রকাশ করে সে বাঙালী কখন দারিদ্র্য বরণ করে নিতে ইচ্ছুক নয়। এক সঙ্গে থাকলে, সৃজনশীল বাঙালী একটা উপায় অবশ্যই বের করত। কিন্তু বাঙালীর শত্রুরা বাঙালীকে কখনই এক হতে দেয়নি। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ দখলকারী শত্রুদের মতিগতি সাইফুর রহমান কেন বুঝতে চাননি?

কোন জাতির শক্তিমান মানুষেরা স্বজাতির বিপক্ষে যাওয়া মানে ঐ জাতির সর্বনাশ ঘটা। জেলখানায় পুত্রকে জড়িয়ে কান্না আসলে ঐ সর্বনাশেরই একটি চিত্র। ১৯৭৫ সালে ঘরে ঢুকে জাতির শত্রুরা বাঙালীর ঘরে ঘরে হানাহানি, বিভেদ ও অনৈক্যের আগুন জ্বেলে দিয়েছে। ঐ আগুনেই সাইফুর রহমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চরিত্রশক্তি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তখন থেকে শেখ হাসিনা, সাইফুর রহমান, বদরুদ্দোজা চৌধুরী, কিবরিয়া, মতিয়া, মেনন যদি এক থাকতেন, আজকের মত এতো অপমান কারও কপালে জুটত না।

এটা এখন নিশ্চিত, সাইফুর রহমানদের অর্থাৎ বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক নতুনভাবে প্রোথিত সাম্প্রদায়িক হায়েনা-শক্তির স্থায়ীকরণে সৃষ্ট বিএনপির নেতাদের আর মুখ দেখাবার পথ নেই। চোরের মতো মাথা নত করে পথ চলতে চলতে তাদের এখন ভেবে দেখা উচিত এমন কেন হয়েছিল? এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে আজ কেন লাখ লাখ পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, জামাতাকে প্রতিদিন কাঁদতে হচ্ছে সাইফুর রহমানের মতো?

আসলে ওরা রবীন্দ্রনাথের কথা শোনেনি–তাই তাঁর অভিশাপে দগ্ধ হচ্ছে : "হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান"। ওরা জাতির পিতার কথা শোনেনি– "ও মিয়ারা, আমি সাফ সাফ কইয়া দিবার চাই, সাফ কাপুইড়্যা মানুষ থাইকা বাঁইচা থাকবা"। ওরা সুকান্তের কথা শোনেনি– "এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ মোর দৃঢ় অঙ্গীকার"। ওরা নজরুলের কথা শোনেনি, "আমি সেইদিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, অত্যাচারীর খড়গকৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না"। ওরা শামসুর রাহমানের কাছ থেকে স্বাধীনতার অর্থ বুঝে নেয়নি। আজকে বাংলাদেশে যারা শক্তির দাপটে অন্যায় করে যাচ্ছে কিংবা অন্যদের অপমান করার শাস্তি হিসাবে নিজেরা অপমানের নরকে জ্বলছে, তাদের কেউ কখনও জানতেও চায়নি তাদেরই একজন পূর্ব-পুরুষ উদাত্ত কণ্ঠে বলে গেছেন 'মানুষেরে তুমি যত কর ঘৃণা, খোদা যান তত দূরে সরে' কিংবা 'শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'।

সাইফুর রহমানের কান্না সমস্ত বাঙালী জাতির অপমান ও পরাজয়ের কান্না। এখন যারা ঘরে ঘরে হানা দিচ্ছেন, তারাও কিন্তু মানুষকে অপমান করছেন। দুর্নীতি আছে বলেই একটি মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত হচ্ছে, এ সহজ সত্যটি অনুধাবন করলে, তাঁরা দুর্নীতির উৎসটিকেই আগে ধ্বংস করতেন। কে না জানে, বাংলাদেশের সকল দূর্নীতির শুরু হয়েছে মুজিব-হত্যার বিচার না করে, জোরপূর্বক সংবিধান পরিবর্তন করে, এবং 'মানি ইজ নো প্রবলেম' বলে হাজার হাজার মানুষকে রাতারাতি দুর্নীতির স্বাদ দিয়ে। মোদ্দাকথা, ১৯৭৫ সালে বেদখল হয়ে যাওয়া বাঙালীর রাষ্ট্র বাঙালীর কাছে ফেরত না আসা পর্যন্ত দুর্নীতির উচ্ছেদ হবে না। বাঙালীর রাষ্ট্র বাঙালীর নিয়মে না চললে, সাইফুর রহমান, হাসিনা, খালেদা, সালমান রহমান, নাজমুল হুদাদের গোপন ও প্রকাশ্য কান্নার যে শব্দ বাংলার আকাশ-বাতাস ভারি করে আছে, তা ভবিষ্যতেও চলবে; এখন যারা মানুষকে অপমান করছেন, তাঁদের কান্নাও শুনবে ভবিষ্যতের বাঙালী।

[লেখক : নিউইয়র্ক প্রবাসী কলামিস্ট]

আদিবাসী গারো সমাজে নারীর অবস্থান

জাহান আরা রউফ

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়কে বৃহত্তর বড়ো মানবগোষ্ঠীর একটি শাখা বলে ধরে নেয়া হয়। বাংলাদেশে গারোদের প্রথম বসতিকালের কোন সুনির্দিষ্ট ইতিহাস সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে নবম-দশম শতাব্দীর দিকে বাংলাদেশে গারো পাহাড়ের পাদদেশে সমতল ভূমিতে এদের বসতি স্থাপনের ঐতিহাসিক প্রমাণ সুসং দুর্গাপুরে গারো রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণে পাওয়া যায়। এদের যারা পাহাড়ে বাস করে, তারা 'আচিক' মানে খাঁটি মানুষ আর যারা সমতল ভূমিতে বাস করে, তারা 'মান্দি' মানে মানুষ হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পছন্দ করে। বাংলাদেশে বসবাসরত গারো জনগোষ্ঠী বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা, ভালুকা, ফুলবাড়িয়া, ফুলপুর, হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া, জামালপুর ও শেরপুর জেলার শ্রীবর্দী, নক্‌লা, নালিতাবাড়ী, শেরপুর, ঝিনাইগাতি, বখশিগঞ্জ, টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল, মধুপুর, নেত্রকোনা জেলার পূর্বধলা, দুর্গাপুর, কলমাকান্দা এবং সুনামগঞ্জ জেলার তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ প্রভৃতি এলাকায় বসবাস করছে। এরা এ দেশের ভূমিজ সন্তান নয়।

আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ের সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক। মাতৃশাসিত গারো সমাজে গারোদের বংশ পরিচয় ঘটে মায়ের সূত্রে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মাকেই পরিবারের প্রধান হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং মায়ের পদবিতে সন্তান তার পরিচিতি লাভ করে।
গারো হিলসের বনোগিরি নামক গ্রামকে বলা হয়– "বনেফানে নকফান্তি"। এই 'বনেফানে নকফান্তি'তেই প্রথম মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। সর্বপ্রথম এখান থেকেই এই মাতৃতান্ত্রিক প্রথার উৎপত্তি এবং পরবর্তীতে সমগ্র গারো সমাজে এই প্রথার প্রচার, প্রসার এবং প্রচলন ঘটে। মাতৃতান্ত্রিক প্রথা প্রচলনের পর থেকেই গারো সমাজে কোনো পুরুষ নয়, শুধু মেয়েরাই পরিবারের সম্পত্তির মালিকানা লাভ করতে থাকে। নারী হয়ে ওঠে পরিবারের প্রধান, সর্বময়ী কর্ত্রী।
মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মেয়েরাই হয় পরিবারের সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। মাতৃসূত্রীয় প্রথানুযায়ী পুরুষের অর্জিত সম্পত্তিরও উত্তরাধিকারিণী হয় নারী। গারো পরিবার ও সমাজে নারীর অধিকার ও প্রাধান্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গারো পরিবার নারী দ্বারা শাসিত এবং নারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। নারীশাসিত গারো পরিবারে পুরুষের ভূমিকা অনেকটাই গৌণ। অনেক সময় দেখা যায় যে, পুরুষকে ভাগ্য বিড়ম্বিত অনিশ্চিত জীবন যাপন করতে হয়। মায়ের সম্পত্তির কোনো মালিকানা ছেলেসন্তান লাভ করতে পারে না। ছেলে সন্তান লাভ করতে পারে না মায়ের পদবিও। পদবিকে গারো ভাষায় বলা হয়– 'মাচং' বা "মাহারী অলাৎ"। বিয়ের পর ছেলেকে মাতৃগৃহ ত্যাগ করে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বসবাস করতে হয়। যদিও বিয়ের পর ছেলেরা শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ঘরজামাই হয়ে থাকে, তথাপি সংসারে এদের গুরুত্ব নারীর চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। ঘরজামাইকে শ্বশুর বাড়িতে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। বাড়ির সমস্ত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব পড়ে ঘরজামাইয়ের ওপর। পরিবারের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় সব ধরনের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে এবং বিচার-সালিশের ব্যাপারেও ঘরজামাইকে যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা এবং স্বাধীনতা দেয়া হয়ে থাকে।
পর্যালোচনা করে দেখা গিয়েছে যে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সংসারের দেখভালের অধিকার যেমন একজন স্বামীকে দেয়া হয়, তেমনি তাকে স্ত্রী শাসনের অধিকারও দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু আইন অথবা পারিবারিক ও সামাজিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রী তার স্বামীকে শাসন করার মতো কোনো অধিকার খাটাতে পারে না। এ বিষয়ে মনীন্দ্রনাথ মারাক তাঁর গারো কৃষ্টি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করছেন যে, মেয়েরা সম্পত্তির মালিক হলেও পরিবার প্রতিপালনের, পরিচালনের, তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পুরুষদের হাতেই ন্যস্ত থাকে। সমাজ ব্যবস্থা স্বামীকে স্ত্রী শাসনের অধিকার দিয়েছে, কিন্তু স্ত্রীকে স্বামী শাসনের অধিকার দেয়নি।
মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কোনো গারো পুরুষই সম্পত্তির মালিকানা পায় না। বিবাহসূত্রে গারো পুরুষ যা কিছু লাভ করে অথবা নিজে শ্রমের মাধ্যমে অর্জন করে, তার সব কিছুরই অধিকারী হয় তার স্ত্রী। গারো নারীর হাতে থাকে সংসারের কর্তৃত্ব। যার ফলে সংসারের সবার ভরণ-পোষণ এবং দায়-দায়িত্ব নারীকেই বহন করতে হয়। মাতৃতান্ত্রিক গারো সমাজে মায়ের প্রাধান্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে নারীর দায়িত্ব অপরিসীম। মাতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত গারো পরিবারে মা-ই পরিবারের কর্ণধার, সমস্ত সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিক এবং নিয়ন্ত্রক। মায়ের আদেশ-নির্দেশ এবং পরামর্শে গারো পরিবার পরিচালিত হয়। মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা নিয়ে গারো সমাজে তেমন কোনো আক্ষেপ নেই। বরং এদের এ সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে এদের অনেকেই রীতিমতো গর্ববোধ করে। পরিবারের কর্ত্রীর হাতে পারিবারিক সমস্ত দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে কর্তা থাকে নিশ্চিন্তে। এদের সমাজে নারীর স্থান অত্যন্ত সম্মানজনক। নারীকে স্বাধীন সত্তার অধিকারী হিসাবে পূর্ণ মর্যাদা দেয়া হয়। এদের সমাজে নারীর পারিবারিক, সামাজিক নিরাপত্তা এবং অপরিসীম আত্মসম্মানের বিধান রয়েছে। পুরুষ দ্বারা খুব কম সংখ্যক নারীই নির্যাতিত হয়ে থাকে। নারীকে কখনও দুর্বল অবলা বলে এদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় না।
পারিবারিক সমস্ত সম্পত্তির মালিকানা থাকা সত্ত্বেও একজন গারো নারীর সমাজে কোন প্রকার নেতৃত্ব দেয়ার অধিকার নেই। পারিবারিক, সামাজিক সব ধরনের নেতৃত্ব পুরুষই দিয়ে থাকে। তবে, নারী বিচার-সালিশে উপস্থিত থেকে পুরুষের নেয়া সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে শান্তি স্থাপনের জন্য যে ভোজের ব্যবস্থা করা হয়, তাতে সানন্দে অংশগ্রহণ করে।
গারো নারী অত্যন্ত পরিশ্রমী। জুম চাষ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করা ছাড়াও এরা হাল কর্ষণের মাধ্যমেও ফসল ফলানোর কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। গভীর জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা বাজারে বিক্রি করে। বাজারে সওদা বেচাকেনার কাজ করে দক্ষতার সঙ্গে। সুচারুরূপে একাধারে সংসারের কাজকর্ম এবং সন্তান পালনে গারো নারী তুলনাহীন। এক টুকরো কাপড় দিয়ে ছোট বাচ্চাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে গারো নারী যেমন তার সাংসারিক কাজকর্ম সমাধা করে, তেমনি মাঠে-ঘাটে কাজ করার সময় অথবা পাহাড় জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করার সময়ও সে তার সন্তানকে পিঠে করে বয়ে বেড়ায়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুসন্তান গারো মায়ের কাছে দেবতাতুল্য।
গারো পরিবারে একজন গর্ভবতী মায়ের বিশেষ যত্ন নেয়া হয়। একজন মা যাতে একটি সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারে, সেজন্য গর্ভবতী মায়ের খাবার এবং কাজের ধরনের দিকে পরিবার থেকে খেয়াল রাখা হয়। গর্ভবতী মা পেটে সন্তান ধারণ করে শুয়েবসে আলসে সময় কাটায় না। শুধুমাত্র ভারি কাজ করা থেকে সে বিরত থাকে এবং সুষম খাদ্য গ্রহণ করে।
খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত গারো সমাজে যেমনি দ্রুত শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে, তেমনি পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারেও এসেছে বিরাট পরিবর্তন। বহির্জগতের সঙ্গে এদের যোগাযোগ বাড়ছে। তবে পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনে এদের যত পরিবর্তনই আসুক না কেন, সচেতন গারো সমাজ তাদের পূর্বপুরুষের কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে ধরে রেখেই আধুনিক জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চায়।
গারো সম্প্রদায়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষার হার অনেক বেশি। আজকাল গারো মেয়েরা শুধু ঘর-সংসার আর কৃষিকাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে না, বরং সংসারের বাইরে নিজেদের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে নিয়োজিত করে আর্থিক সচ্ছলতা আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে গারো মেয়েরা শিক্ষকতার কাজ, বিভিন্ন হাসপাতাল এবং পার্লারে, শপিং সেন্টারে চাকরি করছে। দিনকে দিন গারো নারী বর্তমান সভ্যতা সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা এবং কর্মজীবনের পরিধিকে বৃদ্ধি করে চলেছে।
পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, আদিবাসী গারো সমাজে নারী-পুরুষের মাঝে বৈষম্য নেই বললেই চলে। গারোদের সমাজ ব্যবস্থা মাতৃতান্ত্রিক হওয়া সত্ত্বেও পুরুষের ওপর গারো নারী একচ্ছত্র অধিকার খাটাতে পারে না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারীকে যেমন প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, তেমনি পুরুষকেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। আর তাই দেখা যায় যে, আদিবাসী গারো সমাজে নারী-পুরুষ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। আসলে আদিবাসী গারো সম্প্রদায়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় কতগুলো অলিখিত বিধি-নিষেধ নিয়ম কানুনের মাধ্যমে নারী এবং পুরুষের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং পারিবারিক এবং সামাজিক অবস্থান এমনভাবে নিরূপণ করা হয়েছে যে, নারী-পুরুষ পরস্পরের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। গারো সম্প্রদায় তাদের ওপর আরোপিত অলিখিত পারিবারিক ও সামাজিক আইন-কানুন অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে মেনে চলে।
গারোদের জীবনযাত্রায় যতই পরিবর্তন আসুক না কেন, এদের সামাজিক মৌলিক অবকাঠামো কিন্তু পূর্বের মতোই রয়ে গেছে। পূর্বপুরুষের আদিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে সমুন্নত রেখেই এরা বর্তমানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেদের আধুনিকীকরণ করতে চায়।